এক উপবাসী অনিকেত কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

অণ মুখোপাধ্যায়

“বন্ধু মহলে আমার লেখা দুর্বোধ্য বলে নিন্দিত। হিতৈষীদের বিচারে সংস্কৃত আর ইংরাজী ভাষার বর্ণশঙ্কর ঘটিয়ে আমি যে অস্পৃশ্য রচনানীতির জন্ম দিয়েছি, বঙ্গভারতীর নাটমন্দিরেও সে হরিজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ; এবং আত্মনির্ভরের অভাববশতই আমি যেকালে গুজনদের ভর্ৎসনা ভাজন, তখন ওই অহেতুক অপবাদকে অমূলক বিবেচনায় উপেক্ষা করা আমার সাধ্যের অতীত।” বলেছেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ অক্টোবর। পিতা প্রখ্যাত বৈদান্তিক দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। কাশীর থিয়সফিস্ট হাইস্কুল ও কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের কৃতী ছাত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম. এ. পাঠ করে বাবার কাছ থেকে নিয়েছেন অ্যাটর্নিশিপ-এ দীক্ষা। ব্যুৎপত্তি ছিল জার্মান ও ফরাসী ভাষায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেছেন। উল্লেখযোগ্য কাজ ঃ ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২ বছর সম্পাদনা করেছেন ‘পরিচয়’ পত্রিকা। ‘ফরওয়ার্ড’ ও ‘সবুজ পত্র’-এর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কিছুদিন কাজ করেছেন এ. আর.পি-তে, কিছুদিন স্টেটসম্যান পত্রিকায়। অধ্যাপনা করেছেন চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রাজেশ্বরী বাসুদেব (দত্ত) ছিলেন তাঁর সহধর্মিনী। ‘অর্কেস্ট্রা’, ‘ত্রন্দসী’, ‘উত্তর ফাল্গুনী’, ‘সংবর্ত’, ‘প্রতিধ্বনি’, ‘দশমী’, ‘তন্বী’ তাঁর কাব্যগ্রন্থ। ‘স্বগত’, ‘কুলায় ও কালপুষ’ তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ।প্রয়াত হয়েছেন ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জুন।

বুদ্ধদেব বসুর মতে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি। বুদ্ধদেব বসু বলতে দ্বিধা করেননি, তাঁর মতো নানাগুণসমন্বিত পুষ রবীন্দ্রনাথের পরে আমি অন্য কাউকে দেখিনি। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জীবনে ছিলেন রবীন্দ্র-প্রভাবিত। “জনমে জনমে, মরণে মরণে, / মনে হয় যেন তোমারে চিনি। / ও-শরমার্ত অরূপ আনন/ দেখেছি কোথায় হে বিদেশিনী?/ নীল নবঘন, চঞ্চল আঁখি/ যে তড়িৎময়ী কালবৈশাখী/ থেকে থেকে আজ হানিছে আমার/তাপনিরিত্ত চিত্তাকাশে, / ফুরায়েছিল কি বিগত জীবন/ ও-মদমত্ত সর্বনাশে?” এই জিজ্ঞাসার মধ্যেই সুধীন্দ্রনাথের কাব্যবৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর করকমলে উৎসর্গিত ‘অর্কেস্ট্রা’র অধিকাংশ কবিতাই প্রেমের। যে প্রেম দেহাত্মবাদী, অচির, নিরাশালিপ্ত। রোম্যান্টিকতায় ভরা ‘শাশ্বতী’। “একদা এমনই বাদলশেষের রাতে / মনে হয় যেন শতজনমের আগে / সে এসে, সহসা হাত রেখেছিল হাতে, / চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে।” চিরকালীন আর্তি ধ্বনিত হয়েছে কবিতার চরণে চরণে। “স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে / অমর রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণাঃ / সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে / আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।।”

‘তন্বী’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে। প্রকাশক এম. সি. সরকার অ্যান্ডসন্স। উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে। অর্ঘ্য ঋণশোধের জন্য নয় ঋণস্বীকারের জন্য। সুধীন্দ্রনাথ ভূমিকায় বলেছেন, “পরবর্তী কবিতাগুলোর উপরে স্বদেশী বিদেশী অনেক কবিই ছায়াপাত করেছেন-- সবসময়ে গ্রন্থকারের সম্মতিক্রমে নয়। কেবল রবীন্দ্রনাথের ঋণ সর্বত্রই জ্ঞানকৃত। সত্য বলতে কি, সমস্ত বইখানা খুঁজে যদি কোনওখানে কিছুমাত্র উৎকর্ষ মেলে, তবে তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ ব’লে ধ’রে নেওয়া প্রায় নিরাপদ। তবু এই চুরির জন্যে আমি লজ্জিত নই, কেননা শুধু সুন্দরের মোহ যে চোরকে পাপের পথে ডাকে, সে নিশ্চয়ই নীতি পরায়ণ নয়, কিন্তু রূপজ্ঞ বটে। ওই লুণ্ঠিত সম্পদের একটা বিস্তা

রিত তালিকা এইখানে দিতে পারলে, হয়তো, মহাবিদ্যার অপবাদটা অনেকখানি লঘু হত। কিন্তু সে লোভ পরিহার করছি, কারণ পাঠকের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি আমার শ্রদ্ধা অগাধ।''

পাঠকের প্রতি এত আস্থা, শ্রদ্ধার জন্যই কি প্রিয় পাঠককে একটু পরিশ্রম করতে হয়? 'অনামিকা শঙ্কা', 'বিপ্রলব্ধ প্রেতের আর্তনাদ, 'ত্রমায়াত ঋণে', 'শটিত শবের স্বাদ', 'নিষ্প্রতিকা', 'আস্য', 'অনিকাম অবসাদ', 'সমবায়ী অপরান্তে' ইত্যাদি আভিধানিক শব্দ সম্ভার ব্যবহার করেছেন। উৎসর্গ করেছেন 'সংবর্ত' কাব্য আবু সয়ীদ আইয়ুবকে। এই কাব্যগ্রন্থে ব্যাপ্ত হয়েছে অনেক বেশি ইতিহাসচেতনা। 'সংবর্ত', 'নান্দীমুখ', '১৯৪৫', 'যযাতি', 'প্রত্যাবর্তন', ইত্যাদি কবিতাগুলিতে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক মাৎস্যন্যায়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

রবীন্দ্র প্রভাব অস্বীকার করা যাবে না যদি পড়ি 'শরতের সোনা গগনে গগনে ঝলকে, / ফুকারে পবন, কাশের লহরী ছলকে ;'' (নান্দীমুখ) টি. এস. এলিঅট, বোদলেয়ার, মালার্মে, ভালেরি, হাইনরিখ হাইনেও সুধীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছেন।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতার অনেক ধ্রুপদী লক্ষণ চোখে পড়ে। পরিবেশের বিদ্ধতা রোমান্টিক কবির মত তাঁকে বিদ্রোহী করেনি, তাঁর নায়ক শুধু নির্বেদের পান্ডুরোগে আক্রান্ত হয়েছে। বস্তুবাদী বলেই তিনি দেহবাদী এবং আদর্শবাদের সমস্ত রোমান্টিক ব্যাধি থেকে নিরাসক্তভাবে মুক্ত। বিকল্পের আভিজাত্যবোধে তিনি কাব্যের রূপ অর্জন করেছেন সংযম ও সুমিতির দুরূপ গুণ। কালজ্ঞান ও ইতিহাসচেতনা তাঁর ধ্রুপদী কাব্যের মূল লক্ষণ। সামাজিক দায়িত্ববোধ তিনি অস্বীকার করেননি। বুদ্ধি ও চৈতন্যকে মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ মনে করে দাণ দুর্বিপাকেও তা বিসর্জন দেননি। তাই 'জেমস' কবিতায় লেখেন, ''বহুকষ্টে শিখেছি সাঁতার, / অন্তত স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাওয়া শক্ত নয় আর।/নদীতেও নানা বাঁক আছে,/সেগুলোর কোনওটাতে ঠেকে গিয়ে বাঁচে/এমন লোকেও যার সাঁতারের স-টুকু জানে না।''

সুধীন্দ্রলাথ প্রথম জীবনে এক বিদেশিনীর প্রেমে পড়েছিলেন। তাঁর সমস্ত কবিতাই প্রায় -- তাঁকে উদ্দেশ্য করে লিখিত। নীলিম নয়ন ও ধ্যানসম কেলিপরায়ণ উড্ডীন কেশপাশ রমণীকে কবি ভুলতে পারেন না। লেখেন, ''এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে' অথবা, 'সে এখনও বেঁচে আছে কিনা/তা সুদ্ধ জানি না।'' কবি নাটকের চরিত্রের মত মঞ্চে এসেছেন নায়কের মুখোশ পরে, অপরূপ নাটকীয় দুরত্ব সৃষ্টি করেছেন। লিখছেন, ''নাটকী নায়করূপে আজীবন দেখেছি নিজেকে,/ভেবেছি আমার সঙ্গে অদৃষ্টের দ্বৈরথসমর।'' অথচ কবি চলে যান নেপথ্যের চির অন্ধকারে। '' নেপথ্যে আমার স্থান, অন্ধকারে অধিকারী হাসে''। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে নিষ্ঠা, সংহত ব্যঞ্জনা, স্বল্পভাষ কাব্যাদর্শ, ইন্দ্রিয়ঘনতা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও প্রেরণা। অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন বিবীক্ষা, মননশীলতা, সক্রিয় বুদ্ধিনির্ভর পরিশ্রম। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় বলা যায়, ''সুধীন্দ্রনাথের তনু-তন্ময়তার সঙ্গে মিলেছে তার অভিজাতিক সুমিতি, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোক তাঁর দুর্লভ মননশীলতায় গম্ভীর।'' সুধীন্দ্রনাথ আশ্রয় করেছিলেন ব্যঞ্জনাধর্মী লিরিক-এ। সুধীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, ''মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যদর্শই আমার অন্বিষ্ট। আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষারূপেই বিবেচ্য। ছন্দে শৈথিল্যের প্রশ্রয় না দিয়ে, লঘু-গু, দেশী-বিদেশী, এমনকি পারিভাষিক শব্দও আচরণীয় কিনা, সে অনুসন্ধানও হয়তো কোনও কোনও কবিতায় রয়েছে, এবং শব্দ ও ছন্দ উভয়ই যেহেতু পরজীবী তাই বর্তমান শব্দবিন্যাস ও ছন্দোব্যবহারের ভূমিকা লেখকের ভাবনা-বেদনা যার বহিরাশ্রয় আবার ইদানীন্তত ঘটনাঘটন।''

সুধীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন 'বৈদেহী' শব্দ। কবিতায় 'দেহহীনা' ব্যঞ্জনা নিয়ে হাজির হয়। যেমন 'স্মৃতির মিসরী বীজ' এ মিসর বা বীজ কোনোটাই প্রধান নয়। প্রধান হল পিরামিডের মধ্যে পাওয়া বীজের উর্বরতা, পুনত্থান, পুনর্জন্ম।

''পাতী অরণ্যে কার পদপাত শুনি?/ জানি কোনওদিন ফিরবে না ফাল্গুনী/তবে অঞ্জলি উদ্যত কেন পলাশে?'' (প্রতীক্ষা) 'ফাল্গুনী' কথাটি এখানে অর্জুনকে বোঝাচ্ছে না, ফাল্গুন মাসকে বোঝাচ্ছে না। ব্যঞ্জিত হচ্ছে বসন্তকাল। বসন্তের সঙ্গে যৌবন, প্রাণশক্তি, উল্লাস, সঞ্জীবনী মন্ত্র।

মালার্মের নেতিবাদী জীবনদর্শনেও প্রভাবিত হয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ। মালার্মে যেমন গোরস্থান, কবর, মৃত্যু, ভাঙা জাহাজ, নাস্তি, অবসাদ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন, সুধীন্দ্রনাথও তেমনি প্রয়োগ করেছেন মভূমি, নরক, শব, প্রাবরণী, পিশাচ, শটিত ইত্যাদি শব্দ। নির্বেদ, বিবিক্তি শব্দে ধবনিত হয়েছে বিষাদ-তিক্ততা ও নাস্তির ইঙ্গিত।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুগচেতনার অদ্ভুত মিশ্রণ এসেছে তাঁর কবিতায়। তিনি চেয়েছিলেন এমন এক রাষ্ট্র--'ব্যোমযান, কামান, পদাতি/ যে রাষ্ট্রের অঙ্গ নয়; ন্যায়, ক্ষমা, মিতালী, মনীষা/ যার মুখ্য আলম্বন, জিজীবিষা/সামান্যলক্ষণ;''

(সংবর্ত) তিনি দেখেছেন রাজনীতির সর্বনাশা রূপ। লিখছেন, "আমি বিংশ শতাব্দীর/সমানবয়সী; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে ; বীর/নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে/বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে/নিস্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে/যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।" (যযাতি) ইউরোপীয়বুদ্ধিজীবীদের মত কবি নিজেও গণতন্ত্রে আস্থা হারিয়েছেন। জনতার গড্ডলিকা প্রবাহ তাঁর পক্ষে পীড়াদায়ক। লিখছেন, "সহে না সহে না আর জনতার জঘন্য মিতালী।" (প্রত্যাখ্যান) আবার পাই "আমারে ডরায় লোকে, জনসংঘ বিভীষিকা মোর।" (প্রতীক) তৎকালীন রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে বিভ্রান্ত সাধারণ মানুষ ছিল কানামাছির সমতুল। ত্রাণের পথ নেই। চারদিক সংবর্ত অর্থাৎ প্রলয়ের মেঘে আচ্ছন্ন। মৃত স্পেন, ম্রিয়মান চীন, কবন্ধ ফরাসী দেশ মহাযুদ্ধের শেষও কবিকে শান্তি দেয়নি।

"অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই; /অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই; /বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।" (প্রতীক্ষা) এই নিরাবলম্ব, নিঃসন্তান, নিরাশ্রয়, নিঃস্বতার ছবি ঘুরে ফিরে এসেছে 'সংবর্ত' ও 'দশমী'তে।

আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর মনে হয়েছে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান অবদান মনন ও আবেগের সমীকরণ। বুদ্ধদেব বসু মনে করেছেন সুধীন্দ্রনাথের মনীষিতা ও নাস্তিকতার নান্দীপাঠ নতুন যুগের নতুন কালের বৈশিষ্ট্য।

"ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?" (উটপাখী) অথবা 'অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?" 'ত্রন্দসী' কাব্যের 'উটপাখী' কবিতায় এই দুটি প্রশ্নবাণে লুকিয়ে রয়েছে মানুষের আত্মপ্রবঞ্চনা, আত্মহননের ইঙ্গিত। মাত্রাবৃত্তে রচিত অন্ত্যমিলসম্পন্ন 'উটপাখী' কবিতায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতি কবি তাঁর নির্বেদ দৃষ্টি প্রসারিতকরেছেন। তাই লিখতে পারেন, 'আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে/আমরা দুজনে সমান অংশীদার/অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,/ আমাদের পরে দেনা শোধবার ভার।" কবি এখানেই থামেননি। প্রবাদের মত উচ্চারণ করেছেন, "অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?"

যে কবি সমাসবদ্ধ পদ, তৎসম শব্দ, বিদেশী শব্দ নিয়ে অনায়াসে নাড়াচাড়া করে কবিতায় মিশিয়ে দিতে পারেন, যিনি দেশি বিদেশি কবির প্রভাবে প্রভাবিত হয়েও একেবারে নিজস্ব, দুর্বোধ্য, দুরূহ, যাঁর সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেন "স্বাভাবিক কবি'--আশ্চর্য তিনি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কেমন সহজভাবে সহজ ভাষায় অনেকটা মধুসূদনীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখেন তাঁর অকৃতজ্ঞ কবিতার চরণগুলি। "আমার মৃত্যুর দিনে তাই যদি অলস জিজ্ঞাসু/মাগে শবপরিচিতি, বিনা ভাষ্যে বোলো তারে, সখ্য, --/জগতের কোনও কাজে লাগেনি এ--অখ্যাত গতাসু, /যায়নি অনাথ ক'রে কোনও মৌন হৃদয়--অলকা।"

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জগতের কোনও কাজেই কি লাগেননি? পাঠক, বিচার কন আপনারাই।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com